IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

একটি মনসামঙ্গল পুথি প্রাথমিক আলোচনা

Dr. Durba Deb
Assam University

'পুঁথি' শব্দটা এসেছে সংস্কৃত 'পুস্তক' শব্দ থেকে। সাধারণতঃ পুঁথি বলতে আমরা 'বই-পত্র' এসব বুঝে থাকি। ইংরেজিতে পুঁথি শব্দটা old manuscript অর্থে বোঝানো হয়। কিন্তু বর্তমানে শিক্ষিত মহলে পুঁথি শব্দটা একটা বিশেষ অর্থ বহন করছে। মুদ্রনযন্ত্র আবিষ্কারের পূর্বে যে সমস্ত বই বা খাতা হাতে লেখা হত তাকেই অর্থাৎ সেই হস্তলিখিত অবয়বকেই বর্তমানকালে পুঁথি হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই অবয়বের জন্যে ভূর্জপত্র, তালপাতা বা তুলোটকাগজের সাহায্য নেওয়া হত। সেই কাগজে বিশেষ ধরণের কালি দিয়ে লেখা গত পাণ্ডুলিপিগুলো।

পুঁথি লেখককে 'লিপিকর' বলা হয়। অবশ্য কেউ কেউ লিপিকর শব্দটির জায়গায় 'লিপিকার' শব্দ ব্যবহার করেছেন। পুঁথি রচয়িতা সাক্ষর হলে নিজেই লিপিকরের কাজ চালিয়ে যেতেন নতুবা সে কাজ সম্পন্ন করতে সাহায্য নেওয়া হত অন্য কোন সাক্ষর ব্যক্তির।

পুঁথি লেখার জন্য তিন ধরনের পত্র বা পাতা ব্যবহৃত হত-

(১) ভূর্জপত্র

(২) তালপত্র

(৩) তুলোটকাগজ

(১) ভূর্জপত্র গ্নভূর্জ উদ্ভিদের পত্র। বাংলায় একে ভূজ্জপিত্তর বা ভোজপাতা বলা হয়। এই উদ্ভিদের বাকলকে ছায়ায় শুকিয়ে তারপর কেটে পুঁথির পত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

(২) তালপত্র ষ্মকচি তালপাতাকে কেটে মধ্যে কার শিরা উঠিয়ে এক দুই দিন জলে ভিজিয়ে তারপর ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে লেখার কাজে লাগানো হত।

(৩) তুলোট পত্র ঋছেড়াকাপড়, ঘাস আর কলিচুণের মাধ্যমে প্রস্তুত করা হয় এই কাগজ। তবে এ ধরণের কাগজ তৈরির প্রয়াস খুবই কষ্টসাধ্য।

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী "প্রাচীন পুঁথি গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ"- গ্রন্থে বাংলা পুঁথিকে ৯টি ভাগে ভাগ করেছেন। সেগুলো হলো-

(১) উপকরণগত, (২) অবয়বগত, (৩) চরিত্রগত, (৪) উদ্দেশ্যগত, (৫) অঞ্চলগত, (৬) কালগত, (৭) রচনাকারগত, (৮) অঙ্গগত, (৯) ধারাগত।

বাংলা পুঁথির প্রাচীনত্ব বলতে ধরা হয় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কিছু পুঁথি যার মধ্যে কয়েকটির হরফ বাংলা এবং এগুলোর রচনাকাল মোটামুটি ১১৯৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। প্রাচীনযুগের প্রথম নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চিয়ের যে পুঁথি, তার লিপি নেওয়ারী হরফে লেখা।

পুঁথি সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় বরাক উপত্যকার এখনও কোন উল্লেখযোগ্য বিশ্লেষণ হয়নি। এ অঞ্চলের পুঁথি সাহিত্য অবহেলিত। এর প্রধান কারণ দুটি। প্রথম কারণ হল দুষ্প্রাপ্যতা আর দ্বিতীয় কারণ হল পুঁথি পাঠজনিত সমস্যা- যার বড় প্রতিবন্ধক হল পুঁথির হরফ।

এ অঞ্চলে বন্যা একটি বা□সরিক বিপর্যয়। বন্যার ফলে অনেক মূল্যবান পুঁথিও চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেছে। আর্দ্র আবহাওয়াও পুঁথি সংরক্ষণের আরেকটি বড় অন্তরায়। তদুপরি আছে কীটের উপদ্রব।

এ অঞ্চলে পুঁথি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন জগন্নাথ দেব। এ সম্পর্কিত তার "শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় প্রাচীন পুঁথির বিবরণ"- রচনাটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ□ পত্রিকায় (ঊনবিংশ ভাগ, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- মহামহোপাধ্যায় শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ) প্রকাশিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধে তিনি শিলচর নর্মাল স্কুল লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত (সংস্কৃত ও বাংলা) কতকগুলি প্রাচীন পুঁথির নাম উল্লেখ করে মূলতঃ দুটি পুঁথি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

এরপর শিলচর নর্মাল স্কুল থেকে প্রকাশিত 'শিক্ষাসেবক' পত্রিকায় (১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৪৩ বাংলা, পৃঃ ১০১-১১২) "প্রাচীন হস্তলিখিত বাংলা পুঁথির তালিকা" নামে পুলিন বিহারী ভট্টাচার্যের আরেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি আসলে নর্মাল স্কুলে সংরক্ষিত সবকটি পুঁথির তালিকা।

বর্তমান নিবন্ধে আমি একটা মনসামঙ্গল পুঁথি নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা করছি। এ ব্যাপারে আমাকে প্রথম অবহিত এবং উ□সাহিত করেন আমার শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশাই ডাঃ অমলেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁরই নির্দেশে আমি বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং বহু মূল্যবান পুঁথির অধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রী কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহোদয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি আমার প্রস্তাব শুনে ত□ক্ষণা□ আমার হাতে পুঁথিটি তুলে দেন। শুধু তাই নয় বয়সজনিত বাধা সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন সময় পুঁথিটির পাঠ উদ্ধারে আমাকে সাহায্য করছেন এবং নিয়ত উ□সাহ যুগিয়ে যাচ্ছেন।

পুঁথিটি হল 'জানকীনাথের পদ্মাপুরান' পুঁথিটি তুলোট কাগজে লেখা। দৈর্ঘ্য ২৯.৫ সে.মি.। প্রস্থ- ৯.৫ সে.মি.। পাতা সংখ্যা ২৪৫। প্রতি পাতায় ৫/৬/৭/৮ লাইন। পুঁথির লিপিকাল ১২৩৬ বাংলা।

'পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যে দেবী মনসা, কোথাও পদ্মা, কোথাও কেতকা।

শৈবে চাঁদসদাগর দেবী মনসার পূজায় রাজী ছিলেন না। ফলস্বরূপ সদাগর ছয়পুত্র হারালেন, 'সপ্তডিঙ্গা মধুকর'ও জলমগ্ন হল। ইতিমধ্যে তার আরেকপুত্র লক্ষীন্দরের জন্ম হয়েছে। চাঁদ লক্ষীন্দরের সঙ্গে বেহুলার বিবাহ স্থির করলেন। কিন্তু দেবীর সর্প লৌহবাসরেই লখীন্দরকে দংশন করল। কলার ভেলায় হয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হল লখীন্দরের দেহ। বেহুলাও স্বামীর শবের পাশে স্থান করে নিল নিজেরে। তারপর নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবরাজকে তুষ্ট করে স্বামীর প্রানভিক্ষা চাইল। পুত্রবধূর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। সদাগর মনসার পূজা সম্পন্ন হল।

এই হল মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণের প্রচলিত কাহিনি। কাহিনি সর্বত্রই একইরকম। শুধু অঞ্চলভেদে ভাষা, উপস্থাপনের ভঙ্গিমা, উপকরণ ও রীতি-নীতির কিছু পার্থক্য ঘটেছে।

জানকীনাথ তার পদ্মাপুরাণের শুরুতেই অন্যান্য মঙ্গল কবিদের মত নিজেকে মনসার দাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

"শ্রীহরি সিহাত্র পণ্ডিত জানকিনাথ মনসার দাস।
পদবন্দপৌদ্যপুরাণ করিল প্রকাস।।"

ঊষা এবং অনিরুদ্ধের দ্বারাই যে দেবী মনসার পূজা মর্ত্যে প্রচারিত হয়েছিল তার ও উল্লেখ রয়েছে পুঁথিতে-

"ইন্দ্রে বোলে পদ্যাবতি বোলিছি উত্তম।
তুমার কথাএ আমা খণ্ডিলিকে ভ্রম।।

অনিরুদ্র উসা আমি দিলাম তুমারে।
পূজিবা তুমারে তারা জন্মিআ সংসারে।।"

পুঁথিতে চাঁদ সদাগরের বানিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে সেসময়কার বিবরণ এরকম-

"ঢাকঢুল দমদমা বাজে সব নাএ।
কামানবন্দুক কওে করিলেক জাএ।।
সঙ্কসিঙ্গাকরতাল বাএ একবোরে।
বনোবাসি করতাল হাজারে ২।।
সতকে নিসান উড়ে সর্ব্বদায় নাএ।
কহে ২ নির্ভ করে কহে গতি গাএ।।"

মনসার প্রকোপে চাঁদের বাণিজ্যতরী ডুবে যাওয়ার পর চাঁদের বিপর্যস্ত অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন জানকীনাথ এভাবে-

"সক্তিহিন সদাগর উটিতে নাপারে।
জলে ভাসি উপবাসি আছিল সাগরে।।
পরিধানবস্তু নাহি হইছে ডিগাম্বর।
লজ্জাএ কুপর চান্দ হইল কুপান্তর।।

আচম্বিত কপিন পাইল একখান।
জতু করি পিন্দে চান্দে দারিদ্র সমান।।
সাগরের তিরে হাটে খুদাএ বিকিল।
হাটীতে পাইল পথে কলার বাকল।।
বাকল পাইআ তুষ্ট চম্পকের নাথ।
থুপাইআ বাকল লইল সহসাত।।"

তারপর পুঁথিতে আছে লখীন্দর বিয়ে করতে চলেছেন উজানীনগর, তার সঙ্গে চলছে রকমারি তত্ত্ব, বিভিন্ন সাজে সজ্জিত বরযাত্রী। তাদের মধ্যে কারো হাতে মসাল, কারো কাধে গদা, কারো হাতে পুষ্প, কারো হাতে ঘৃত-দধি-দুগ্ধ। উল্লেখ আছে, 'তিন সত-মানব চলে হাত তালি দিআ'। এছাড়া কামান বন্দুকেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বর্ণনার মধ্যে সদাগরের প্রতিপত্তি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

লক্ষীন্দর বিপুলার বিবাহ সভার বর্ণনায় আছে-

"দক্ষিণে ব্রাহ্মণগণ বৈসে সারিসারি
বসিলা পছিমমুখি সাহের কুমারি।।
নামগুত্রে মহাবাক্য করে সবদিকে।।
বাপের নিকটে কণ্যা রহে মহালাজে
নানারত্নে উর্দ্ধগিআ সাঁহে সদাগর।
সস্থি বোলি গ্রহণ করিলা লক্ষিন্দরো।।
উছর্গিয়া দিলা সাহে পরম কৌতুকে।
হরি২ পুনি২ বোলে সর্ব্বলুকে।
সেইকালে একাসনে আনিআ বৈসাইল।।"

তারপর বেহুলার তৈরি রান্নায় রয়েছে বিভিন্ন ব্যঞ্জনের উল্লেখ-

"আগর চন্দন কাষ্ট খণ্ড ২ করি।
অগ্নি দিআ পাতিলা বৈসাইল সারিসারি।।
সব অগ্নি দিআ তবে ব্রম্মারে প্রণামে।
নালিতার সাক কন্যা রান্দিল প্রথমে।।
রান্দিল গিমাই সাক তিক্ত আছে বড়।
ঘৃতপক্ক দিআ পাছে রান্দিল কুমড়া।।
এলাচির সাক রান্দে করলার আগে।
নানাবিধি সাক রান্দিল একযুগে।।
তিল দিআ বড়া সব রান্দে কতুহলো।
পাখলোতে তই (?) দিআ রান্দিল আর্থনা।।
আম দিআ আম্বল রান্দে রাঙ্গা চাগুনি।
মুগ দিআ ডাইল রান্দে তরসির হানি।।
নিরামিস্ব রান্দি কন্যা থৈল এক পাসে।
মর্ছমাংস রান্দিবারে তখনে প্রবেসে।।
পাতিলা মার্জন করি দিল তৈলপাক।
বৃহতিমৎছ দিআ রান্দিল মূলাসাক।।
সরিসার সাক রান্দে ইলসির সিরে।
কুমড়াপলাস রান্দিল তারপরে।
সটুন খনাএ ভাল রান্দিল বেঞ্চুন।
কাতলের সিরে ঘন্ট রান্দিল তখন।।
পাবতো নালিতা রান্দে তিক্ত আছে ভালা।
মাগুরে মরিচ রান্দে মিষ্টি ২ ঝাল ২।।
কৈ মাছ দিআ আদা শুকত রান্দিল।
মাংস দিআ মাংস বেঞ্চুন ভাল হইল।।
ইচাবাচা ভাজিলেক চিতলের কুর।
সুনিদ্রামশিল দিআ রান্দিল মধুর।।
পরে ভাজা কইল আর সটনে পনা।
লাচমাছ ভাজা কইল নাহিক তুলনা।।
রান্দিলেক কচু কন্যা চেঙ্গপনা দিআ।
মরিচপিপলিতাতে সরিসা মাখিআ।।
রান্দিআ বেঞ্চুন সব করি পরিপাটী।
উত্তম সাইলের অন্ন রান্দিল সুন্দুরী।।
নানাবিধি পিষ্টক রান্দিলে তার পাছে।
নাম কত দিতে পারি সঙ্কেপে কহিছে।।

বাসরশয্যায় লখীন্দরের ডান পায়ে সাপ দংশন করে-

'ক্রুধ করি নাগ গুটা বুসিলেক বড়।
দক্ষিণ চরণ চাপি মারিল কামড়।।"
সে সময়ে লক্ষীন্দরের অবস্থা-
'কণ্ঠবিরোধ হইল নাল পড়ে মুখে।
তলিআ পড়িল লক্ষাই বিপুলা সমুখে।।

তারপর মৃত লখীন্দরকে দেখে বিলাপরত বেহুলার করুণ অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন জানকীনাথ এভাবে-

"লখাইর নাসাতে বাউ চাহে ততক্ষণ।
জানিল জীবন নাহি হইছে অচেতন।।

ভূমিতে পড়িয়া কন্যা বৌকে হানি খাও।
কেন হেন করিলা জগত গৌরিমাও।।

কত পাপ কইলু দেখ মই অভাগিনি
প্রাণনাথ হারাইলু কিছু সে না জানি।।

খেন উঠে খেন বৈসে পাগলের মতে।
খেন ২ দুইহাতে বোক কুটে মাথে।।"

পুঁথির শেষে দেখা যায় সদাগর লক্ষীন্দর সহ অন্য ছয় পুত্র এবং ধন রত্ন সমেত নিমজ্জিত তরী প্রাপ্তির পর পুত্রগণের অনুরোধে দেবী মনসার পূজায় রাজী হলেও শৈবে চাঁদ যেহেতু ডান হাতে হরগৌরীর পূজা করেন তাই বা হাতে একবার দেবী মনসার উদ্দেশ্যে পুষ্প অর্পন করবেন বলে স্থির করেছিলেন-

"পুত্র সবে বোলে জত প্রবোদ বচন।
নাসুনে তারার বাক্য রহে আরমন।।

জেই হাতে সানন্দে পুজিছে হরগৌরি।
সেই হাতে পুজিতে নাপারি বিস্বহরি।।
জত্ন করি তিরা জদি বোলহ আমারে।
একবার পুষ্প আমী দিমু বাম করে।।"

এই আলোচনার উদ্দেশ্যে এ অঞ্চলের একটি পুঁথির প্রাথমিক পরিচিতি দান। বিবাহ আচার এবং রন্ধন বর্ণনা অংশ আঞ্চলিক সংস্কার ও জীবনাচরণের পরিচয়বাহী। মধ্যযুগীয় জনজীবনে খাওয়া-দাওয়ার যে বর্ণনা আছে, তা আমাদের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক সম্পদ। সেই ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন আর ঘটবে না- কিন্তু আমাদের লুপ্ত ঐতিহ্যের বিচার বিশ্লেষণের জন্য তা যে সংরক্ষণযোগ্য আশা করি এতে কারো দ্বিমত নেই।

সহায়ক গ্রন্থ :

১ . প্রাচীন পুঁথি গবেষণা পদ্ধতি ও প্রয়োগ- ডাঃ জয়ন্ত গোস্বামী ।

২. বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত- শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ।